তৃতীয় অধ্যায়

পটভূমি ইতিহাস (দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা)

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস নিয়ে যে সব উপন্যাস রচনা করেছেন, 'যুগলাঙ্গুরীয়' ভিন্ন, সেগুলির সময়কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত, — অর্থাৎ প্রায় ছ'শো' বছর। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই দীর্ঘ কালসীমার মধ্য থেকে উপন্যাসের কাহিনী কথনের ক্ষেত্রে সর্বত্রই ক্রান্তিকালকে নির্বাচন করেছেন।

কালের হিসাবে 'মৃণালিনী' ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় তুর্কী বিজয় ও তার সমকালের কাহিনী। 'দুর্গেশনন্দিনী' ষোড়শ শতকের শেষভাগে মোগল বিজয় কাহিনী। 'সীতারাম' সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সন্ধিকালে, মোগল শাসনের দুর্দিনে হিন্দুর পুনরুত্থান প্রচেষ্টার কাহিনী। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করলেও বাংলাদেশে ইংরেজদের সামরিক শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে, নবাব মীরকাসিমের পরাজয়ের পর। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এই ক্রান্তিকালের কথা আছে। বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তি প্রাধান্য লাভ করলেও দুর্ভিক্ষ ও দস্যুতার ফলে দেশ ছিল বিশৃঙ্খল। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই বিশৃঙ্খলা দূর করে ইংরেজের সুশৃঙ্খল রাজ্য স্থাপনের কথা আছে। 'দেবী চৌধুরাণী' আনন্দমঠের প্রায় সমসাময়িক কালের কথা।

ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নের এই সব ঘটনার উত্থান-পতনের ঘন-ঘটার মধ্য থেকে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ এবং নাটকীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিক্ষোভের ফলে ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইতিহাসের সীমারেখা অতিক্রম করার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় কোথাও উপন্যাসের অনুরোধে ইতিহাসের 'তথ্য'-কে এবং ইতিহাসের অনুরোধে উপন্যাসের 'সত্য'-কে বিকৃত করেন নি। তিনি অসাধারণ প্রতিভা বলে অতীতের প্রাণস্পন্দনটুকু উপলব্ধি করেছেন এবং আশ্চর্য কুহক বলে ভাষার অতীত এক লুপ্ত জগৎকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত ও দীপ্ত করে তুলেছেন।

দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৮০) থেকে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা–বিহার–উড়িষ্যার পাঠান-বিদ্রোহ এবং মোগল–পাঠানের সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত। এই বিদ্রোহ দমন করেন মোগল–সম্রাট আকবরের অন্যতম সেনাপতি অম্বরাধিপতি মানসিংহ। ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, "During 1590 the rebellion in Bengal, Behar and Orissa was finally crushed by Man Singh and his son Jagat Singh." [১]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন — " বাস্তত : 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিষয় বস্তু হইল মুঘল সম্রাট কর্তৃক পাঠানদের হাত হইতে বঙ্গবিজয়। বঙ্কিম পদে পদে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিয়া এটাকে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ'ও প্রায়শ: সত্য ইতিহাস হইতে লওয়া এবং সেই যুগের উপযোগী চরিত্র ও ভাব দিয়া সাজাইয়া তাহাদের খাড়া করা হইয়াছে। এমন কি, মানসিংহের বহু–নারী–বল্লভত্ব, রাজপুত–সম্ভ্রান্ত ঘরে নিম্নজাতীয়া বাঁদী ('পাস্‌বান্' বা 'পাত্রী') রাখা: বঙ্গে মানসিংহের প্রতিনিধির অতুলনীয় বীরত্ব এবং অধিক সংখ্যক পাঠান সেনার পরাজয়, দুর্গ মধ্যে অত্যাচার ও খুন – এ সব কথা সেই যুগের সত্য ইতিহাস হইতে জানা যায়। তাঁহার কল্পনা হইতে আসিয়াছে শুধু জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেমকাহিনী এবং আয়েষার দেবকন্যা সদৃশ চরিত্র–কথা।" [২]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের কাহিনী–সূত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পেয়েছিলেন। তাঁর খুল্লপিতামহের কাছ থেকে।" .... তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়েছেন, যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজ্যাকুরদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তী রূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজ্যাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে

প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎ সিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার-উনিশ বর্ষ বয়ক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হইল।" [৩]

খুল্লপিতামহের কাছে পাওয়া কাহিনী সূত্রের সঙ্গে চার্লস স্টুয়ার্টের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। স্টুয়ার্ট লিখেছেন — "In the year 998, the Raja (Man Singh) planned an expedition for the recovery of Orissa out of the hands of the Afghans. Having assembled the troops of Behar, at Bhagalpur, he marched through the Western hills to Burdwan; but previous to his setting out, he had ordered Sayid Khan to march with the troop of Bengal by the route of cutwa, and to form a junction with him at Burdwan. Upon his arival at this place, he received an apology from his deputy, stating that he had experienced so much difficulty and delay in equipping his army, he was afraid the rainy season would set in before anything could be effected against the Afghans; and therefore strongly adviced the Raja to Canton his army till the conclusion of the rains, when he would immediately join him. The Raja was much disappointed at this intelligence; but seeing no remedy, he directed cantonments to be built for the army at Jehanabad, on the bank of the Darkisor river, not many miles distance from present Calcutta." [৪]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে স্টুয়ার্টের এই বর্ণনার প্রায় হুবহু অনুবাদ প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন —

" ১৯৬ সালে মানসিংহ পাটনা নগরীতে উপনীত হইয়া প্রথমে অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন। পর বৎসরে উৎকল বিজিগীষু হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। মানসিংহ প্রথমে পাটনায় উপস্থিত হইলে পর, নিজে তন্নগরীতে অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় করিয়া বঙ্গপ্রদেশ শাসন জন্য সৈদ খাঁকে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। সৈদ খাঁ এই ভারপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী তণ্ডানগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে রণাশায় যাত্রা করিয়া মানসিংহ প্রতিনিধিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সৈদ খাঁকে লিখিলেন,যে, তিনি বর্দ্ধমানে তাঁহার সহিত সসৈন্যে মিলিত হইতে চাহেন।

বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া রাজা দেখিলেন যে, সৈদ খাঁ আসেন নাই, কেবলমাত্র দূত দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে,সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব সম্ভাবনা, এমন কি, তাঁহার সৈন্যসজ্জা করিয়া যাইতে বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে ; অতএব রাজা মানসিংহ আপাততঃ বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত শিবির সংস্থাপন করিয়া থাকিলে তিনি সেনা সমভিব্যাহারে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। রাজা মানসিংহ অগত্যা তৎপরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া দারুকেশ্বরতীরে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। তথায় সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় রহিলেন।" [৫]

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ইতিহাস গ্রন্থে স্টুয়ার্ট হিজরী সন এবং উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সনের ব্যবহার করেছেন। রাজা মানসিংহ ৯৯৭ হিজরী সন বা ৯৯৬ বঙ্গাব্দে বিহারের বিদ্রোহ দমন করে ৯৯৮ হিজরী সন বা ৯৯৭ বঙ্গাব্দে ঝাড়খণ্ডের পথে উড়িষ্যা জয় করার জন্য যাত্রা করেন। তিনি ভাগলপুর ও বর্দ্ধমান হয়ে জেহানাবাদে পৌঁছান এবং সেখানে শিবির স্থাপন করেন।

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন' বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণের পথে একাকী গমনকারী জগৎসিংহ নামে একজন অশ্বারোহী যুবা পুরুষের সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পাঠকদের প্রথম পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — " জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তর মধ্যে একাকী গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদে ইতিবৃত্ত - সম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য্য ভাল নহে।" [৬] বঙ্কিম-চন্দ্রের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, এখানে তিনি অত্যন্ত সচেতন ভাবে ইতিবৃত্ত —

সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদটি সংযুক্ত করেছেন এবং ইতিকথা বিবৃত করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর সময় পর্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে প্রথম রচিত বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থের (Charles Stewart's History of Bengal) অনুসরণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্টুয়ার্টের ইতিহাস এবং কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেন। এই উপন্যাস রচনাকালে 'দুর্গেশনন্দিনী'র সময়কার অনেক ঐতিহাসিক তথ্যই অজ্ঞাত ছিল। পরবর্তীকালে নবাবিষ্কৃত তথ্যাদির নিরিখে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আমাদের জানিয়েছেন — "বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সত্য ইতিহাস কতটুকু আছে ? মানসিংহ, জগৎসিংহ, কুৎলু খাঁ, খাজা ইসা, উস্মান — ইঁহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ এবং সে যুগে বঙ্গের ঠিক সেই স্থলে বাস করিতেন। ইহাও সত্য ইতিহাস যে, জগৎসিংহ অগণিত পাঠান সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া এক দুর্গে আশ্রয় লন এবং তাহার কিছুদিন পরেই কুৎলু খাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দেওয়ান খাজা ইসা কুৎলুর বালক পুত্রদের রাজ্য বাঁচাইবার জন্য মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ভিন্ন 'দুর্গেশনন্দিনী'র আর সব কথা কাল্পনিক। এই সন্ধিতে জগৎ সিংহ মধ্যস্থ ছিলেন না। তবে, বঙ্কিম কি বাকী সব ঐতিহাসিক দৃশ্যপট নিজ কল্পনা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ? আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা সকলেই কাল্পনিক। এ কথা পাঠক সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন ; এবং তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জগৎ সিংহের আহত হওয়া, কুৎলুর দুর্গে আবদ্ধ থাকা, এবং তাহার দ্বারা কুৎলুর মরণকালে সন্ধিভিক্ষা করা, এই শাখাপল্লবগুলি ইতিহাসের বাহিরে হইলেও বঙ্কিমের নিজকল্পনায় সৃষ্টি নহে। এগুলি আসিয়াছে ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক সাহেবের লেখা হইতে, তিনি কাপ্তান এলেকজাণ্ডার ডাও (Alexander Dow)। এই সাহেবটি ফিরিস্তার রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইংরেজীতে প্রায়শঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্রে ফিরিস্তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্য্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন, যাহা ফিরিস্তাতেও লেখেন নাই; এমন কি, কোনও পারসিক লেখকের পক্ষে সেরূপ লেখাও সম্ভব ছিল না।"[৭]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের রচনা ভিন্ন অন্য সূত্র থেকেও আমরা জানতে পারি যে, কতলু খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেওয়ান খাজা ইসা মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন, এই

সন্ধিতে জগৎসিংহ মধ্যস্থ ছিলেন না। ঐতিহাসিক এস.রায় বলেন — ".... the sudden death of Qutlu Khan shortly after disheartened the Afghans. His minister Khvaja Isa raised his young son Nasir Khan to the throne and he made peace with the Mughuls...." [৮]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, পাঠানদের কাছে পরাজিত হয়ে জগৎসিংহ কোনো এক দুর্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু জগৎসিংহ কি অবস্থায় কোন্ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন তার বিবরণ যদুনাথ অন্যত্র দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন — " মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ মদিরামত্ত অবস্থায় কৎলু খাঁর সেনাপতি বাহাদুর কার: কর্তৃক পরাজিত ও আহত হইয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের যত্নে সেই রাজধানীতে পানাইয়া গিয়া বাঁচেন, ইহা সত্য ঘটনা — এবং ইহা আবুল ফজল বর্ণনা করিয়াছেন।" [৯]

পক্ষান্তরে স্টুয়ার্টের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, ধরপুরে আফগানরা জগৎসিংহের কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধির জন্য আলোচনার ভান চালিয়ে যায়, যা জগৎসিংহ ধরতে পারেন নি, এবং সেই সুযোগে, গোপনে কতলু খাঁকে সংবাদ দিয়ে অতিরিক্ত সৈন্য আনিয়ে " .... the Afghans made an attack upon him (Jagat Singh) by night, surprise his camp, took him prisoner, ..." [১০] লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পাঠানদের হাতে জগৎ সিংহের বন্দিত্বের যে বিবরণ স্টুয়ার্ট দিয়েছেন 'আকবরনামা' অনুসারে তা' সঠিক নয়। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে 'আকবরনামা'র বিবরণই মান্য করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পাঠানদের হাতে জগৎ সিংহের বন্দিত্বের সূত্রটিকেই অত্যন্ত সুকৌশলে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন। এই সূত্র ধরেই জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রণয় কাহিনীর সঙ্গে আয়েষা ও ওসমান যুক্ত হওয়ায় 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই অনৈতিহাসিক হলেও এই সূত্রকে অবহেলা করা যায় না। আবার এই ঐতিহাসিক বিচ্যুতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকেও দায়ী করা যায় না। কারণ, প্রথমত: দুর্গেশনন্দিনীর রচনার সময় পর্যন্ত 'আকবরনামা'র কোনো ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি এবং ফারসি না জানায় বঙ্কিমচন্দ্র মূল গ্রন্থটিও পড়তে পারেন নি। দ্বিতীয়ত: তিনি তাঁর সময় কালে আধুনিক পদ্ধতিতে রচিত স্টুয়ার্টের

বাংলাদেশের ইতিহাস যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেছেন। সুতরাং তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছেন, একথা বলা যায় না।

এই উপন্যাসে তিলোত্তমা, বিমলা, আয়েষা, অভিরাম স্বামী প্রভৃতি চরিত্র অনৈতিহাসিক। দাউদ খাঁ, মনাইম খাঁ, খাঁ আজিম, শাহবাজ খাঁ, সৈদ খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই সব ঐতিহাসিক চরিত্রের নামোল্লেখ ভিন্ন উপন্যাসের কাহিনী মধ্যে তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, বঙ্কিমচন্দ্র কথিত সৈদ খাঁ নামটি প্রকৃত পক্ষে সাইদ খাঁ হবে ; যার অর্থ ভাগ্যবান। সাইদ খাঁ, সৈয়দ বংশোদ্ভূত নন এবং তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনী কালে বাংলাদেশের প্রকৃত সুবাদার ছিলেন। মানসিংহ তখন ছিলেন বিহারের সুবাদার। সুতরাং মানসিংহ, সাইদ খাঁকে বাংলায় নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র যে বর্ণনা করেছেন তা' সঠিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভুলের কারণ, স্টুয়ার্টকে অনুসরণ। স্টুয়ার্ট সাইদ খাঁকে বাংলার Deputy Governor হিসাবে ভুল করায় বঙ্কিমচন্দ্রেরও ভুল হয়েছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' মোগল-পাঠানের সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত। মোগল পক্ষের প্রধান দিল্লীর সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ। সম্রাট আকবর তাঁর পিসিকে এবং যুবরাজ সেলিম (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর) তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁর কাছে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ পরাজিত হন। তাঁর রণকৌশল ও বাহুবলে বঙ্গদেশ থেকে কাবুল পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপন্যাসের প্রথমখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দারুকেশ্বর নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করে সাইদ খাঁর জন্য প্রতীক্ষা এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'নবীন সেনাপতি' নির্বাচন করে পাঠানদের গ্রাম-লুণ্ঠন ও প্রজাপীড়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাই, — যা বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ দক্ষতার উপস্থাপিত করেছেন।

এই উপন্যাসে পাঠানপক্ষের প্রধান উড়িষ্যার পাঠান নবাব কতলু খাঁ। ইতিহাস পাঠে আমরা জানি — "Qutlu Khan Lohani, a leiutenant of Daud, defeated several Mughal officers and set up an independent principality in

Orissa." [১১] কতলু খাঁ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে — " কতলু খাঁর এই নিয়ম ছিল যে, কোন দুর্গ বা গ্রাম জয় হইলে, তন্মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট সুন্দরী যদি বন্দী হইত, তবে সে তাঁহার আত্মসেবার জন্য প্রেরিত হইত।" [১২] বঙ্কিমচন্দ্রের বিবরণ অনুসারে কতলু খাঁ বিলাসী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। কিন্তু " আকবরনামায় তাঁহাকে crafty এবং scoundrel বলা হইলেও (এই নিন্দাবাদের কারণ এই যে, তিনি দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া নিজেকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।) তাঁহার উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তির উল্লেখ নাই।" [১৩] তবে সে কালের মুসলমান শাসকদের প্রায় সকলেরই বহু উপপত্নী থাকত এবং তাঁরা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন ; তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা অবাস্তব বলা যায় না। স্মরণ রাখতে হবে যে, পাঠানেরা মান্দারণের জমিদারের স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে যায়, — এ কিংবদন্তী বঙ্কিমচন্দ্রের জানা ছিল।

তবে এই উপন্যাসে বিমলা কর্তৃক কতলু খাঁর হত্যার ঘটনাটি অনৈতিহাসিক। স্টুয়ার্টের ইতিহাসে, এমন কি কিংবদন্তীতেও, এই প্রসঙ্গ নেই। যদুনাথ সরকার 'আকবরনামা' থেকে অনুবাদ করে আমাদের জানিয়েছেন যে, — " এই সময় শাহানশাহের ভাগ্য ফলিল। দশদিন পরে কতলু মারা গেলেন, তাঁহার রোগ হইয়াছিল এবং শীঘ্রই জীবন শেষ হইল।" [১৪] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ রচনাকৌশল গুণে কতলু খাঁর হত্যার এই ঘটনার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনীর সৌন্দর্য ও নাট্যরস ঘনীভূত হয়েছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস বাংলাদেশের পটভূমিকায় রচিত হলেও এই উপন্যাসের নায়ক বাঙালি বা বঙ্গবাসী নন। অম্বুরাধিপতি মানসিংহের পুত্র ও প্রিয় সেনাপতি রাজপুতকুলতিলক জগৎসিংহ উপন্যাসের বীর্যবান আদর্শ নায়ক। খুব সম্ভব, রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্য ও আত্মত্যাগের বিবিধ কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র রাজপুত বীরকে নায়করূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথমখণ্ডের 'কুলতিলক' নামক নবম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি যে, কুমার জগৎসিংহের বীরত্ব ও রণচাতুর্যে পাঠান সেনা মধ্যে মহাভীতি প্রচার

হয়েছে। পাঠান সেনারা লুটপাট বন্ধ করে দুর্গমধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এবং শত্রুপীড়িত প্রদেশে শান্তি বিরাজ করছে। স্টুয়ার্টের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, পাঠান সেনা ধরপুরে লুটপাট ও অত্যাচার শুরু করলে — "... to put a stop to the ravages of the Afghans, the Raja detached his son, Jaggat Singh, who compelled them to retire, and to take refuge under the guns of a fort, ..." [১৫]

'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র জগৎসিংহের যে শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা' স্টুয়ার্টের ইতিহাসের সূত্র অবলম্বনে রচিত। কিন্তু জগৎসিংহের রণবীর্যের বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণা কিছু স্বতন্ত্র। তাঁরা তাঁকে 'অনভিজ্ঞ' আখ্যা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এস.রায় বলেছেন — "The Afghans surprised and badly defeated the Mughal Advance guard under Man Singh's son, the inexperienced Jagat Singh". [১৬] আধুনিক ঐতিহাসিকের এই বক্তব্য আবুল ফজলের 'আকবরনামা' দ্বারা সমর্থিত। আবুল ফজল লিখেছেন — "The Rajah (Man Singh) sent an army under Jagat Singh, and the worthless Bahadur Kuruh took refuge in a fort, and had recourse to cajolery. But devilish tricks he lulled the inexperienced youth into carelessness, and then asked for help from Qutlu. On 10th Khurdad (21st May, 1590) while Jagat was slumbering from the effect of wine, the wicked Qutlu suddenly fell upon him with a large force and prevailed over him.... Though the imperial army was defeated, yet .... Hambir brought away that infatuated young man and took him to his quarters at Bishnupur. A report are so that he was killed." [১৭] এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, জগৎসিংহ অত্যন্ত মদ্যপ ছিলেন এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য অল্পবয়সে, ৬ই অক্টোবর, ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে, আগ্রার কাছে অকালে মারা যান।

আকবরনামায় পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে জগৎসিংহের মৃত্যু বিষয়ে যে মিথ্যা রটনার কথা আছে তা' স্টুয়ার্টের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। স্টুয়ার্ট লিখেছেন —
".... The Raja was overwhelmed with confusion at the disgrace, and with sorrow on account of his son, who was carried prisoner to Bissnupore, and, according to report which prevailed for some days, had been put to death".[১৮]
এছাড়া মোগল পাঠানের সন্ধির বিষয়ে জগৎসিংহের ভূমিকা সম্পর্কে স্টুয়ার্ট লিখেছেন যে, কতলু খাঁর মৃত্যুর পর "The Afghan chiefs released the son of Raja, and, through him send for peace."[১৯]

বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভা বলে এই সূত্র দুটিকে নিপুণ দক্ষতায় জগৎসিংহের মুক্তি - প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যুক্ত করে আশ্চর্য সৃষ্টি চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাস পাঠকালে আমরা দেখি যে, ওসমান জগৎসিংহকে মানসিংহ ও কতলু খাঁর মধ্যে সন্ধির মধ্যস্থতা করার অনুরোধ করে বলেছেন — " মহারাজের নিকট দূত প্রেরণ করা হইয়াছিল ; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট কে রটনা করিয়াছে যে, পাঠানেরা মহাশয়ের প্রাণহানি করিয়াছে। মহারাজ সেই শোকে ও ক্রোধে সন্ধির নামও শ্রবণ করিলেন না ; দূতের কথায় বিশ্বাস করিলেন না ; যদি মহাশয় স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাবকর্তা হয়েন, তবে তিনি সম্মত হইতে পারিবেন।"[২০]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে পাঠান-যুবক ওসমান এক অসাধারণ মহান চরিত্র। পাঠানকুলতিলক ওসমানের ঐতিহাসিক পরিচয়, তিনি কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রিয় সেনাপতি এবং কতলু খাঁর একান্ত অনুগত ভ্রাতা ও দেওয়ান খ্বাজা ইসার পুত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের তিনি প্রতিনায়ক এবং রাজপুতকুলতিলক জগৎসিংহের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন অসম সাহসী বীরযোদ্ধা হিসাবেও তিনি ইতিহাসে পরিচিত। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন এবং বাংলাদেশে পাঠানেরা যখন মোগলের হাতে পরাজিত হয় (১৬১২ খ্রিঃ) তখন ওসমান মোগলের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের আবিষ্কৃত একখানি ফারসি হস্তলিপি 'বাহারিস্তান-ই-ঘাইরী'র যদুনাথ সরকার কৃত বঙ্গানুবাদে পাঠানবীর ওসমানের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। [২১]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে অতিথি পরায়ণ, স্বাধীনতা প্রিয় সাহসী বীর এবং মহান পাঠান যুবক হিসাবে অঙ্কন করেছেন। ওসমান যে মহৎচিত্তের যুবক, 'দুর্গেশনন্দিনী'র দ্বিতীয়খন্ডের 'কুসুমের মধ্যে পাষাণ' নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেখানে আমরা দেখি যে, ওসমান তাঁর পরমবৈরী, রণক্ষেত্রে তাঁর দর্পহারী, জগৎ সিংহের আরোগ্যলাভের জন্য আয়েষার সঙ্গে জগৎসিংহের সেবা করেছেন। আয়েষা তাঁর এই গুণের প্রশংসা করলে তিনি অপ্রতিভ হয়েছেন এবং এই সেবার দ্বারা জগৎসিংহের আরোগ্য লাভের মধ্যে আপন স্বার্থসিদ্ধি আছে বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ওসমান সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা পাছে লোকে দয়ালু চিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন, এবং দয়াশীলতা নারী স্বভাব-সিদ্ধ বলে উপহাস করতে করতে পরোপকার করেন। ওসমানের এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য আফগান বা পাঠান জাতির অনুসারী ; যা বঙ্কিমচন্দ্র যথাযথ ভাবে অঙ্কন করেছেন। [২২]

আফগান বা পাঠান জাতির স্বাধীনতা প্রীতির কথা সর্বজন বিদিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র দ্বিতীয় খন্ডের 'গৃহান্তর' নামক একাদশ পরিচ্ছেদে ওসমান জগৎসিংহকে বারবার পাঠানদের এই স্বাধীনতা প্রীতির কথা বলেছেন। ওসমান বলেছেন — " পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার করে না ; একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখনও করিবেও না ; ইহা নিশ্চিত কহিলাম।" [২৩] প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, 'পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে' জগৎসিংহের প্রতি ওসমানের এই বক্রোক্তি প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের। বঙ্কিমচন্দ্র এই তীক্ষ্ণ বক্রের মধ্য দিয়ে বাঙালির সুপ্ত স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার বাসনাকে জাগতে চেয়েছেন। ডঃ বিজিত কুমার দত্ত বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে কেবল পাঠান ও রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যের চিত্রই আঁকেন নি, প্রসঙ্গক্রমে বাঙালির বাহুবল প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন। সেই সঙ্গে ওসমান যে জগৎসিংহকে অকারণ রাজপুত - পাঠান রক্তপাত বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছেন, তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বিচক্ষণতা লক্ষ্য করা যায়। [২৪]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে আছে হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার মান্দারণ গ্রাম ও তার দুর্গ। এ প্রসঙ্গে Bengal District Gazetteers -এ বলা হয়েছে যে, — "An old place lying in thana Goghat of the Arambagh Sub-division, 7 or 8 miles W.S.W. of Arambagh town. The Burdwan Midnapore road passed west and the old nagpur road a little north of this place. It contains the ruin of two forts, the northern are called Garh Mandaran and the Southern are Bhitagarh." [২৫]

গড় মান্দারণের বিবরণ দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে, — "যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদ প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। .... গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্য তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগর মধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত ; একস্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ এক-খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল ; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনির্মিত এক গড় ছিল ; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশ পথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূল শিরঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত ; দুই দিকে প্রবল নদী প্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলঙ্ঘ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে ; অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে ; তদুপরি তিন্তড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।" [২৬]

এই বিবরণ পাঠে আমাদের মনে হয় যে, অত্যন্ত ক্ষীন হলেও, 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনার সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে বাংলার অতীত ইতিহাস ও তার পুরা-কীর্তির প্রতি একটি সহজাত আকর্ষণ বর্তমান ছিল। তিনি ইতিহাসবেত্তার নিষ্ঠা নিয়ে গড়

মান্দারণের অতীত বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। 'কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি' হয়ে যাওয়া স্মৃতির প্রতি মমত্ববোধ এবংতজ্জনিত প্রাচীন হৃত গৌরব ও সমৃদ্ধির জন্য দীর্ঘশ্বাস ('মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল') বঙ্কিম-চন্দ্রের বর্সেতিহাস চেতনাকে একটি বিশিষ্ট সুর-তন্ত্রীতে বেঁধে দিয়েছে।

।। কপালকুণ্ডলা ।।

'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ এতে স্বল্প ; সে ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের যোগ আরও কম। উপন্যাসের উপাখ্যানের উপর সে ইতিকথার প্রভাবও সামান্য। কিন্তু তবু 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য ও উজ্জ্বল চিত্রকে চমকপ্রদ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথমত: ইতিহাসের পটভূমিতে কপালকুণ্ডলার কাহিনীকে বিস্তৃত করা হয়েছে। কারণ, উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের জীবনের যে অংশ গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিসর সামান্য। তাই নবকুমারের প্রাক্তন - স্ত্রী মোতিবিবির সূত্র ধরে দিল্লী ও সপ্তগ্রাম একত্র গ্রথিত হয়েছে এবং কপালকুণ্ডলার কাহিনী মোগল সাম্রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট কাল-সীমায় ইতিহাসের বৃহৎ ক্ষেত্রে মুক্তি পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ইতিহাসের সুদূরপ্রসারী পটভূমি কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজেডিকে সমুন্নতির গৌরব ও গভীরতা দান করেছে। যে মোতিবিবি কপালকুণ্ডলার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী, তিনি দিল্লীশ্বর আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিমের অঙ্কশায়িনী এবং ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠসুন্দরী ও ভাবী ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানেরও প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। সুন্দরী অগ্রগণ্যা মোতিবিবির যদি এই আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যের বাতাবরণ না থাকত তবে তাঁর ঈর্ষা ও চক্রান্ত সাধারণ গৃহস্থ কুলত্যাগিনীর কলহ-কালিমায় কপালকুণ্ডলার কাহিনীকে কলুষিত করত।[২৭]

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক কাল মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের শেষ সময় থেকে জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহনের সময় পর্যন্ত। উপন্যাসের তৃতীয় খন্ডের, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ; পথান্তরে আমরা দেখি যে জনৈক আগ্রানিবাসী, খাঁ আজিমের আশ্রিত ব্যক্তি মোতিবিবিকে অভিবাদন পূর্বক একটি পত্র দিয়েছে। পত্রে মোতিবিবিকে জানান হয়েছে যে, বাদশাহ আকবরের পরলোকে গতি হয়েছে এবং আকবরের আড়ালে কুমার সেলিম জাহাঙ্গীর শাহ হয়ে মসনদে বসেছেন। ইতিহাস পাঠে আমরাজানি যে, আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয় ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর এবং তার এক সপ্তাহ পরে যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারন করে সিংহাসনে আরোহন করেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কাহিনী সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন এই ভাবে — "প্রায় দুইশত পথগশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রি শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।" [২৮] গঙ্গা-সাগরের পূণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয় পৌষমাসের সংক্রান্তি তিথিতে। আকবরের মৃত্যু, সেলিমের সিংহাসনারোহণ, গঙ্গাসাগর থেকে মাঘমাসের রাত্রি শেষে নবকুমারের যাত্রা, কাপালিকাবাসে অবস্থান, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে বিবাহ ও গৃহে প্রত্যাবর্তন — এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে অনুমান করা যায় যে, নবকুমারের সঙ্গে মোতিবিবির সাক্ষাতের সময় ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে।

বঙ্কিমচন্দ্র মোগল সাম্রাজ্যের নির্দিষ্ট কালসীমায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পট-ভূমিকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ও তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — "পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল ; " [২৯] পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার ঐতিহাসিক সত্য। কবিকঙ্কন চন্ডীতে আছে —

" ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে।।" [৩০]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন — " পর্তুগীজ বণিকেরা যে বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায় বাণিজ্যে বহু অনিষ্ট করিত তাহার প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ পর্তুগীজ বণিকেরা ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে এদেশীয় বাণিজ্যজাহাজের উপর জলদস্যুর ন্যায় আচরণ করিত এবং তাহার ফলেই বাংলার জলপথের বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। আরাকান হইতে মগেদের অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গের সমদ্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল। পর্তুগীজরাও তাহাদের অনুকরণে নদীপথে ঢুকিয়া দক্ষিণবঙ্গে বহু অত্যাচার করিত।[৩১]

কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক, মোতিবিবি – এঁরা কেউই ঐতিহাসিক চরিত্র নন। তবে মোতিবিবির চরিত্রে ইতিহাসের ছায়াপাত আছে। মোগল–হারেমে এমন চরিত্র ইতিহাসের সমর্থন–পুষ্ট। কিন্তু মোগল হারেমের কথা আমাদের আলোচ্য নয়। মোগল-হামেমে সেলিম ও মোতিবিবির সংলাপ ও সম্পর্ক এবং মোগল রাজনীতির চক্রান্তও আমাদের পক্ষে পরিত্যজ্য। তবে শের আফগান ও মেহের–উন্নিসার সম্পর্কে কিছু বলার আছে। কারণ, শের আফগান বাংলাদেশের বর্ধমানের জায়গীরদার ছিলেন এবং মেহের–উন্নিসা তাঁর পত্নী।

শের আফগান — **"A persian adventurer called 'Ali Quli', after rendering good military service, had been attached to Salim's staff, and was rewarded by the title of 'Sher Afgan' (tiger slayer) for his gallant conduct during a hunting expedition."** ৩২
মেহের - উন্নিসার সঙ্গে শের আফগানের বিবাহ হয় এবং আকবর তাঁকে বর্ধমানে জায়গীর প্রদান করেন। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে কুৎবুদ্দীন কোকা বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। বাংলায় তখন নানা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহের সঙ্গে শের আফগানের যোগ আছে সন্দেহে, কুৎবুদ্দীন খাঁ তাঁকে বর্ধমানে গ্রেফতার করেন। সেখানে উভয়ের উত্তেজিত বিতর্কের সময় শের আফগান তরবারি দিয়ে কুৎবুদ্দীনের শিরচ্ছেদন করেন। কুৎবুদ্দীনের পারিষদবর্গ শের আফগানকে সঙ্গে সঙ্গে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে।

মেহের–উন্নিসা বা নূরজাহান এই উপন্যাসে প্রায় নেপথ্য চরিত্র। উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমির সুরক্ষা করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তাঁর সম্পর্কে ততটুকুই বলা

হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র মেহের-উন্নিসা সম্পর্কে যা লিখেছেন তা' ইতিহাসের সত্যকে লঙ্ঘন করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "মেহের উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্য্যে ইতিহাসকীর্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্যে-গীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া ; কবিতা রচনায় বা চিত্রলেখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন।" [৩৩] ইতিহাসে নূরজাহানের পরিচয় এই ভাবে পাই — **"Nurjahan was indeed possessed of exquisite Beauty, a fine taste for persian literature, poetry and arts, a piercing intellect, versatile temper and sound common sense."** [৩৪]

কপালকুণ্ডলার বঙ্কিমচন্দ্র সেলিম-মেহের-উন্নিসার প্রচলিত প্রণয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এ বিষয় ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন এ বিষয়ে ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ — **"finds absolutely no support in the contemporary authorities."** [৩৫]

এই উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্য্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বর্গীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল ; সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণে বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইয়া লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বর্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্তুগীজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু

তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল ; কিন্তু তখনও অনেকাংশে শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।" [৩৬]

সপ্তগ্রামের অতীত গৌরবকথা বলতে গিয়ে ('এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত।') বঙ্কিমচন্দ্র স্টুয়ার্টের History of Bengal -এর সহায়তা নিয়েছেন। পাদটীকায় স্টুয়ার্ট লিখেছেন — "Saatgong was known to the Romans, by the names of Ganges Regia. It is a famous place of worship, and was formerly the residence of the Kings of the country, and said to have been of an immense size." [৩৭]

সপ্তগ্রামে 'ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস' এবং তার 'শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছেন তা' স্টুয়ার্টের ইতিহাস থেকেই নেওয়া। স্টুয়ার্ট লিখেছেন — "A regular Foujedar was appointed from Court, who in the process of time, was made independent of the governor; and all the public officers were withdrawn from Saatgong, which soon declined into a mean villabe, now known to Europeans." [৩৮]

প্রকৃতপক্ষে সপ্তগ্রাম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র আর যা বলেছেন, তা রেনেলের গ্রন্থ থেকে History of Bengal-এ স্টুয়ার্ট কর্তৃক উদ্ধৃত আছে। সেখানে বলা হয়েছে — "Saatgong or Sattagong, now an inconsiderable villave, on a small creek of the Hooghly river, about four miles to the north-west of Hooghly, was, in 1556, and probably the European merchants had their factories. At that time Saatgong river was capable of

bearing small Vessels, and I suspect that its then course, after passing Saatgong, was by way of Adaumpore, Omptah and Tamlook." [৩৯]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে আমরা হতশ্রী মান্দারণ গ্রাম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘশ্বাস শুনছিলাম, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও আমরা হতশ্রী সপ্তগ্রাম সম্পর্কে তেমনি দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই (পূর্বকালে, সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধশালী নগর ছিল)। লুপ্ত গৌরব সম্পর্কে বেদনাবোধ এবং দীর্ঘশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালে তাঁর ইতিহাস চেতনাকে প্রভাবিত করেছে।

সূত্র – নির্দেশ

১। Richard Burn (ed.) – The Cambridge History of India, Vol.IV, 1963, p.159.

২। যদুনাথ সরকার – ঐতিহাসিক ভূমিকা, দুর্গেশনন্দিনী, ১৩৫৮, পৃঃ ৬।

৩। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত - 'কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র', ১৯৬৪, পৃঃ ১০৬–৭।

৪। Charles Stewart History of Bengal, 1904, p.205.

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দুর্গেশনন্দিনী, প্রথম খন্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিমরচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৭। যদুনাথ সরকার – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮ - ৯।

৮। S.Roy — Akbar; The History and Culture of of the Indian people, Vol.VII, Ed. by R.C.Majumder, 1984, p.152.

৯। যদুনাথ সরকার – মধ্যযুগের বাঙ্গালার ইতিহাসের মশলা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৭, পৃঃ ২৩৬।

১০। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.206.

১১। S.Roy — Ibid, p.141.

১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪৭।

১৩। প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত – উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, ১৩৬৮, পৃঃ ৫০।

১৪। যদুনাথ সরকার – ঐতিহাসিক ভূমিকা, দুর্গেশনন্দিনী, ১৩৫৮, পৃঃ ১১।

১৫। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.206.

১৬। S.Roy — Ibid, p.152.

১৭। Abul Fazal — Akbarnama, Vol.III, Trn. by A.Baveridge,1939, p.879.

১৮। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.206.

১৯। Charles Stewart — Ibid, p.206.

২০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খন্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬১।

২১। যদুনাথ সরকার – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬ - ৮।

২২। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ 'আফগান বা পাঠান জাতি' নামক প্রবন্ধে পাঠানদের অতিথি পরায়ণতা, স্বদেশানুরাগ, স্বাধীনতাপ্রীতি প্রভৃতি নানা গুণের প্রশংসা আছে। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি পাঠ করে সে কালের পাঠানদের জাতিগত চরিত্র বৈশিষ্ট্য অবগত হন এবং তার সহায়তায় ওসমান চরিত্র পরিকল্পনা করেন।

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খন্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬১।

২৪। বিজিত কুমার দত্ত – বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৯, পৃঃ ৭৬–৭৭।

২৫। L.S.S.O.Malley — Bengal District Gazetters : Hooghly, 1912, p.288-89.

২৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দুর্গেশনন্দিনী, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃ: ৭–৮।

২৭। বিজিত কুমার দত্ত — প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৭।

২৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — কপালকুণ্ডলা, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃ: ৮৫।

২৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫।

৩০। মুকুন্দরামচক্রবর্তী — কবিকঙ্কন চণ্ডী (২য় ভাগ), ১৯২৬, পৃ: ১৫৪।

৩১। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খণ্ড), ১৩৮৫, পৃ: ২২১–২২।

৩২। Richard Burn (ed.) — The Cambridge History of India, Vol. IV, 1963, p.160.

৩৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — কপালকুণ্ডলা, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃ: ১১৪।

৩৪। R.C.Majumder & Others — An Advanced History of India, 1981, p.459.

৩৫। Beni Prasad — History of Jahangir, 1962, p.163.

৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — কপালকুণ্ডলা, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃ: ১০৭।

৩৭। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.275.

৩৮। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.275.

৩৯। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.273.